রানা প্লাজা হত্যাকান্ডঃ ক্ষতিপূরণ নিয়ে টালবাহানা

২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে রানা প্লাজা ধ্বসের পর,সহস্রাধিক শ্রমিকের লাশের গন্ধ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই, মালিক শ্রেণির সংগঠন বিজিএমইএ এবং মালিক শ্রেণির রাষ্ট্রকে আমরা দেখেছি চোখ উল্টে দিতে, মুখ ফিরিয়ে নিতে। চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা তো দূরের কথা স্রেফ পাওনা বকেয়া মজুরির জন্যই রাস্তায় নামতে হয়েছিলো রানা প্লাজার গার্মেন্টস এর ক্ষতিগ্রস্ত, আহত, কর্মসংস্থান হারানো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাড়ানো শ্রমিকদের। শ্রমিকরা হাসপাতালে ফোলা পেট নিয়ে ডায়ালাইসিসের অভাবে কাতরিয়েছেন, ইনফেকশান হয়ে ব্লিডিং হয়ে মরেছেন, যন্ত্রণা আর ট্রমা সইতে না পেরে অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, এমনকি সালমা নামের এক আহত শ্রমিক যথাযথ চিকিৎসার অভাবে যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন।

ঘটনার পরপর মালিক শ্রেণি সহ সরকারি বেসরকারি দেশী বিদেশি বিভিন্ন পক্ষ থেকে কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ভাবে রানা প্লাজার নিহত ও আহত শ্রমিকদের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ঘোষিত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে রানা প্লাজার শ্রমিকদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান বাবদ জমা পড়েছে প্রায় ১২২ কোটি টাকা। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বিতরণের পর এখনও ১০৬ কোটি টাকা এই তহবিলে ফেলে রাখা হয়েছে। শুধু এই অর্থ নিহত শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেও পরিবারপিছু প্রায় ১০ লাখ টাকা দেয়া সম্ভব ছিলো। দেড় বছর পার হলেও এই টাকাও দেয়া হয়নি, ক্ষতিপূরণও নয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নেতৃত্বে ক্ষতিপূরণের জন্য বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি শ্রম সংগঠন ও সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয় । সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, এই কমিটির ১৩তম বৈঠকে মোট পাঁচটি ধাপে ২৯ বা ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ক্ষতিপূরণের ৪০ শতাংশ সম্পন্ন করার লক্ষমাত্রা ঠিক করা হয়। গত ১ অক্টোবর রানা প্লাজা ডোনারস ট্রাস্ট ফান্ড থেকে আহত শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১২ কোটি ৭০ লাখ টাকা জমা হয়েছে। এর মধ্যে নিহত পরিবারের এক হাজার ৫৫২ সদস্যদের ব্যাংক হিসাবে ১২ কোটি ৫৭ লাখ ৮৩ হাজার ৪১৮ টাকা এবং ৩৫ জন আহত শ্রমিকের ব্যাংক হিসাবে ১৩ লাখ ৬ হাজার ৮৩২ টাকা জমা হয়েছে । কিন্তু ঠিক কোন মানদন্ডে কী হিসেবে নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ঠিক করা হলো এবং মাথাপিছু একজন নিহত/আহত শ্রমিক কত অর্থ পেলেন, তা প্রকাশ করা হয় নি। তাছাড়া ক্ষতিপূরণের এই অর্থ ব্যাংকে জমা করার আগে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দেওয়া অর্থ কর্তন করে রাখা হয়েছে।

কল-কারখানায় যে কোন দুর্ঘটনায় যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিহত ও আহত শ্রমিক ও তাদের স্বজনদের অধিকার। রানাপ্লাজা ধ্বস কোন সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, কাঠামোগত গণহত্যা। এর পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর জন্য শুধু ক্ষতিপূরণ নয়,দায়ী মালিকের সর্বোচ্চ শাস্তি ও জরিমানা সহ কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরী। অথচ বাস্তবে আমরা দেখছি 'ক্ষতিপূরণ নয়, ভিক্ষা'- এই নীতিতে গার্মেন্টস মালিক, তাদের সংগঠন বিজিএমইএ, বিদেশী কর্পোরেট ক্রেতা কোম্পানি এবং বাংলাদেশ সরকার- সবাই একজোট হয়ে রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের ও তাদের স্বজনদের ঘোরাচ্ছে।তাদের মনোভাবটা এমন যে তারা বড়জোর কিছু কিছু করে ভিক্ষা দেবে,কিন্তু সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ কিছুতেই দেবে না! কারণ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিলে দায় স্বীকার করে নেয়া হয়, বাধ্যবাধকতা চলে আসে যা ভবিষ্যতে এরকম যে কোন ঘটনার বেলায় ক্ষতিপূরণের উদাহরণ হিসেবে ববহৃত হবে। সেজন্যই এতো টালবাহানা।❑

লঞ্চ দুর্ঘটনা, না হত্যাকাণ্ড?

৪আগস্ট বেলা ১১টার দিকে মুন্সীগঞ্জের মাওয়ায় এমএল পিনাক-৬ পদ্মা নদীতে ডুবে যায়। যাত্রী ধারণক্ষমতা ৮৫ জন থাকলেও লঞ্চটিতে যাত্রী ছিল তিন শতাধিক। পদ্মায় তখন দুই নম্বর সতর্কতা সংকেত ছিল। এই সংকেত দেয়া হলে ছোট আকারের (৬৫ ফুটের কম দৈর্ঘ্য) এমএল (মোটর লঞ্চ) ক্যাটাগরির লঞ্চ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকে। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই সকালে মাওয়ার উদ্দেশে কাওড়াকান্দি ঘাট ছাড়ে এমএল পিনাক-৬। এছাড়া ফিটনেস ছিল না এমভি পিনাক-৬-এর, এপ্রিলেই শেষ হয় এর ফিটনেস মেয়াদ। এগুলোর সাথে যোগ হয়েছে লঞ্চ মালিকদের মুনাফাখোরি ভূমিকা এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বে অবহেলা।

দুর্ঘটনার পর যথারীতি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি গত ১৪ সেপ্টেম্বর তদন্ত রিপোর্ট নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাছে জমা দিয়েছে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, রিপোর্টে পিনাক-৬ ডুবে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই, ঘাটের অব্যবস্থাপনা, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকে দায়ী করা হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, লঞ্চের ফিটনেস ও নকশায় ত্রুটি ছিল। রিপোর্টে দুর্ঘটনা রোধে ২৬টি সুপারিশ করা হয়েছে। এতে সানকেন ডেক (নিমজ্জিত) লঞ্চ চলাচল বন্ধ করে যুগোপযোগী করা, আইএসও সঠিকভাবে প্রতিপালন, সার্ভেয়ার বাড়ানোসহ জনবল বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রতিবছর লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটলেও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য পাওয়া যায় ১৯৯৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত। এসময়ে সরকারি হিসাবে দুর্ঘটনার সংখ্যা ৩৮৯ এবং বেসরকারি হিসেবে ৬৫৮। দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসাবে ২৯০০ এবং বেসরকারি হিসাবে ৫৫০০। নিখোঁজের সংখ্যা যথাক্রমে ৬০০ ও ১৫০০।

এক হিসাবে ১৯৭৬ সাল থেকে চলতি বছরের মে পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছরে ৭২৭টি লঞ্চ দুর্ঘটনায় প্রায় ৫০০টি তদন্ত কমিটি হয়েছে। কেবল গত দুই দশকেই ২০০টি তদন্ত কমিটি হয়, যার মধ্য থেকে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ পায় মাত্র তিনটির। এগুলোর মধ্যে তদন্ত কমিটির সুপারিশ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছে এমন কোনো নজির নেই।❑

ওষুধের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি

দফায় দফায় ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি পাচ্ছে লাগামহীনভাবে। ওষুধের দাম ও বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার ও ওষুধ প্রশাসনের আইনি ব্যবস্থা না থাকার সুযোগ নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। ২০১২ সালের মাঝামাঝি প্রায় ১২শ' ব্র্যান্ডের ওষুধের দাম ওষুধভেদে ২০ থেকে ১০০ শতাংশ বাড়ানো হয়। এরপর ২০১৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অতি প্রয়োজনীয় দুই শতাধিক ওষুধের দাম ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে কোম্পানিগুলো (সূত্র : দৈনিক সমকাল, ২৬.১১.২০১৩; বণিক বার্তা ১৯.১১.২০১৩)।

'দাম সমন্বয়ের' অজুহাত দিয়ে বাড়ানো হয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্যালাইন, প্যারাসিটামল ট্যাবলেট, বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ, ডায়াবেটিসের ওষুধ, ব্যথার ওষুধ, হাঁপানি ও কাশির ওষুধের দাম। ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় বেক্সিমকোর প্রতিটি ডায়ারিল-১, ২ ও ৩ ট্যাবলেটের দাম ২০১৩-এর সেপ্টেম্বরে যেখানে ছিল যথাক্রমে ৩, ৫ ও ৭ টাকা, সেখানে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা, ৮ টাকা ও ১০ টাকা। একইভাবে এই কোম্পানির উৎপাদিত এক হাজার মিলিলিটার কলোরাইড স্যালাইনের দাম ছিল ৬৮ টাকা। অক্টোবরে তা করা হয়েছে ৯১ টাকা ৭২ পয়সা। একই কোম্পানির নাপা এক্সট্রা ২০০ ট্যাবলেটের দাম আগের ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬০০ টাকা। শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ব্যবহৃত ইনসেপ্টা কোম্পানির কর্টান ২০ মিলিগ্রামের ৫০টি ট্যাবলেটের খুচরা মূল্য ১৮৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩১৩ টাকা। স্কয়ারের ৪০০ মিলিগ্রামের ১০০ অ্যামোডিস ট্যাবলেটের দাম ২০২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৭৭ টাকা করা হয়েছে। একই কোম্পানির ৫০০ মিলিগ্রামের ৩০টি সিপ্রোসিন ট্যাবলেট ৩৬০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৫০ টাকা এবং জিম্যাক্স ৫০০ মিলিগ্রামের ৩০টি ট্যাবলেট ৩৬০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪২০ টাকা। স্কয়ারেরই ৫০০ মিলিগ্রামের এইসপ্লাস ২০০ ট্যাবলেটের দাম ৩৮৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা, অ্যাসিডিটির ২০ মিলিগ্রামের ১০০ সেকলো ট্যাবলেটের দাম ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা এবং দশমিক ৫ মিলিগ্রামের ২০০ এপিট্রা ট্যাবলেট ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০ টাকা করা হয়েছে।

শুধু ২০১২-১৩ মৌসুমে এক বছরের মধ্যেই চার কিস্তিতে ওষুধের দাম বেড়ে তা দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৩-এর নভেম্বরের পর ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির এই ধারা ২০১৪ সালেও অব্যাহত আছে বলে জানা গেছে। ওষুধের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে ওষুধের বাজারে যেমন অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, তেমনি ধীরে ধীরে মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের রোগীদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে অনেক ওষুধ। এভাবে কিছুদিন পর পর ওষুধের দাম বাড়িয়ে মানুষের ওপর খরচের বোঝা চাপানো হচ্ছে। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে দরিদ্র মানুষ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি রোগী ও গ্রামের হতদরিদ্ররা।❑

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল পাস

উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা আইনসভার কাছে ফিরিয়ে আনা সংক্রান্ত বহুল আলোচিত-সমালোচিত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এ বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। পরে এটি আলোচনার জন্য উন্মুক্ত হলে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা বিলটির জনমত জরিপ এবং অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এছাড়া সাতটি সংশোধনী প্রস্তাবও তোলা হয়, তবে সংশোধনী প্রস্তাবগুলো কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। এরপর গোপন ব্যালটে বিভক্তি ভোটে বিলটি পাস হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৩২৮টি ভোট পড়ে। এর বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। সরকার বলছে, এর মাধ্যমে বিচারপতিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে সংসদের বাইরে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞের মতে, এ বিলটি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পরবর্তী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে।❑

আদিবাসী নারী নেত্রী বিচিত্রা তির্কির উপর বর্বর নির্যাতন : ভূমিদস্যুতা ও নারী নিপীড়ন যেখানে একাকার

গত ৪ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর থানার জিনারপুর গ্রামে নিজ জমিতে আমন ধান রোপণের জন্য ক্ষেত প্রস্তুতের কাজ করার সময় মনিরুল ইসলাম, আবুল কালাম, আক্তার, আফজাল হোসেন, আব্দুল হামিদ, আব্দুস সালাম, তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জন সন্ত্রাসী জমিতে কর্মরত আদিবাদী নারীদের উপর আক্রমণ করে। জাতীয় আদিবাসী পরিষদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি ও সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য, ওঁরাও আদিবাসী নেত্রী বিচিত্রা তির্কি ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তাঁকে লাঠি ও রড দিয়েই শুধু মারা হয়নি, ফাঁকা মাঠের আইলের কিনারে নিয়ে তাঁর উপর যৌন নিপীড়নও চালানো হয়! এসময় হামলাকারীরা মহিষ, শ্যালো মেশিন ও পাওয়ার টিলার লুট করে নিয়ে যায়। ১৮ জনের নামসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হলেও আজ পর্যন্ত মূল হোতাদের কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি! উল্টো মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে বলে বিচিত্রা তির্কি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন।

নির্যাতিত বিচিত্রা তির্কির বিবরণ থেকেই আমরা হামলাকারীদের বর্বরতা সম্পর্কে জানতে পারি : "সেদিন আমরা কয়েকজন মেয়ে জমিতে কাজ করছিলাম। বেলা ১২টার দিকে ৩০-৩৫ জন সন্ত্রাসী লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করতে আসছে দেখে আমি অল্পবয়স্ক মেয়েদের পালিয়ে যেতে বলি। তারা সরে গেলেও আমরা কয়েকজন পালাতে পারিনি। ওদের হামলার মূল লক্ষ্যই ছিলাম আমি। সন্ত্রাসীরা আমাকে লাঠি ও রড দিয়ে মারছিল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছিলাম। আমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানিও পড়েনি। আমি ওদের বলছিলাম, 'তোরা আমাকে মেরে ফেল। আমাকে বাঁচিয়ে

রাখলে তোরা কেউই বাঁচবি না।' এরপর মনিরুল ইসলাম, আবুল কালাম ও আক্তার টেনেহিঁচড়ে ফাঁকা মাঠের আইলের কিনারে নিয়ে আমাকে ধর্ষণ করে। ওরা আমার পাওয়ার টিলার, মহিষ ও চাষের যন্ত্রপাতিও লুট করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় আমার স্বামী লোকজন ডেকে আমাকে উদ্ধার করেন। রাত ১২টার দিকে আমি থানায় গিয়ে মামলা করি।"

আমাদের দেশে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনার পেছনেই থাকে স্থানীয় প্রভাবশালী, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ভূমিদস্যুতা! হিন্দু পরিবারগুলোকে মেরে-কেটে, ভয় দেখিয়ে সীমান্তের ওপারে পাঠাতে পারলেই তাদের জমি ভোগদখলে নেয়া যায়! আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তো মেরে-কেটে উচ্ছেদ করারও দরকার পড়ে না অনেক সময়, আদিবাসীদের ভোগদখলে থাকা জমি নিজের নামে দলিল তৈরি করে নিলেই হলো, বা অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিজের নামে জমি রেকর্ড করেই আদিবাসীদের উচ্ছেদের অধিকার পেয়ে যায় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা! রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায়, প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে এভাবে 'কাগজহীন' সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত আদিবাসীদের তাদেরই পত্তন করা জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। সরকারি খাসজমি, ডোবানালা, নদী দখল এই ভূমিদস্যুদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে না; ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জায়গাজমি, আদিবাসীদের জমির দিকেও তাদের লোভের দৃষ্টি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের জিনারপুর গ্রামের আদিবাসী নির্যাতনের নেপথ্যেও রয়েছে এই ভূমি দখলের উদ্দেশ্য। হামলাকারী সন্ত্রাসীরা হচ্ছে ভূমিদস্যু, যারা দখল করে নিতে চায় বিচিত্রা তির্কিসহ আদিবাসীদের ভোগদখলে থাকা জায়গাজমি। বিচিত্রা তির্কি সেটায় বাধা দিয়েছিলেন, আদিবাসীদের সংগঠিত করে জমি রক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, করেছেন ৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদযাত্রা। এ কারণেই ভূমিদস্যুদের রোষানলে পড়েন তিনি। অনেক ভয়ভীতি, হুমকি-ধমকি অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন। তারই প্রতিশোধ নিল যেন ভূমিদস্যুরা। সেই সাথে বিচিত্রার নিজস্ব ২২ বিঘা জমি কেড়ে নিতেও ভূমিদস্যুরা তৎপর। ক্ষমতাসীন দলের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ায় ঘটনার দেড় মাসের বেশি পার হয়ে গেলেও মূল হোতারা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সবিন মুণ্ডা অভিযোগ করেন, "এ মামলার প্রধান আসামিরা সরকারি দলের। তাই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না।"

দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর এমন বর্বরোচিত নৃশংসতা প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলো অবলীলায় চেপে যায়, যেমন করে চেপে যায় পাহাড়ে ও সমতলের আদিবাসীদের উপর সংঘটিত অন্যান্য নৃশংসতার ঘটনা। তার পরও এই ঘটনাটি চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রত্যন্ত জিনারপুর গ্রামের চৌহদ্দি পেরিয়ে কিছুটা নগরে এসেছে। স্থানীয় পত্রপত্রিকা, অনলাইন পোর্টাল হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছুটা সাড়া ফেলেছে, তা তো সেই বিচিত্রা তির্কির কারণেই। বর্বর হামলার শিকার হয়েও তিনি ভয়ে কুঁকড়ে যাননি, নৃশংস যৌন নিপীড়নের সম্মুখীন হয়ে লজ্জায় তিনি মুখ লুকাননি; বরং অপরাধীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন, থানায় গিয়ে মামলা করেছেন। 'গণধর্ষণ'-এর শিকার হওয়ার পরেও নিজের নাম-পরিচয় কিছুই তিনি গোপন করতে যাননি, সাহস নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। যার ফলে মহাপ্রতাপশালী ধর্ষকই এবার মুখ লুকিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। বিচিত্রা তির্কি বলেন, "আপনারা আমার নাম ছেপে দিন, আমার ছবি প্রকাশ করুন। গণধর্ষিত বলে আমি এসবে ভয় পাই না। আমার সঙ্গে তাবৎ উত্তরবঙ্গের লাখ লাখ আদিবাসী ভাই-বোন আছে। আমার স্বামী, ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন সবাই আমার সঙ্গে আছে। লোকলজ্জার ভয়ে আমি নাম-পরিচয় গোপন করলে আসামিরা সকলেই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে। ওরা সরকারি দল আওয়ামী লীগ করে। সকলেই চলে যাবে পর্দার আড়ালে।"❑

তথ্যসূত্র :
http://biplobcht.blogspot.com/2014/09/blog-post.html

তোবা শ্রমিকদের অনশন সংগ্রাম

তাজরীন গার্মেন্টসের শতাধিক শ্রমিক পুড়িয়ে মারার ঘটনায় দায়ী গার্মেন্টস মালিক দেলোয়ার হোসেনের মালিকানাধীন তোবা গ্রুপের প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক গত ঈদুল ফিতরের আগের দিন ২৮ জুলাই তাঁদের তিন মাসের বকেয়া মজুরি আদায় করতে আমরণ অনশনে বসেন। বিজিএমইএ ও মালিকপক্ষ বার বার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও বোনাস পরিশোধ করার লিখিত ও মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করেছে। শ্রমিকরা বার বার রাস্তায় নেমেছেন, পুলিশের মার খেয়েছেন, বিজিএমইএ ঘেরাও করেছেন, শ্রম মন্ত্রণালয়েও গিয়েছেন। কিন্তু মালিক জেলে থাকা অবস্থায় বেতন দেয়া সম্ভব নয়–এই অজুহাতে তাঁদের দাবি মেনে নেয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের নেতৃত্বে তোবা গ্রুপের শ্রমিকরা ঈদের আগের দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু করেন আমরণ অনশন। ক্রমশ এই আন্দোলনের সাথে সাথে যুক্ত হতে থাকেন বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ; গঠিত হয় 'তোবা গ্রুপ শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি'।

ঈদের দিনে শ্রমিকদের অনশনের মতো একটি ঘটনায় সরকার কিংবা বিজিএমইএর প্রথমে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। বিজিএমইএ, মালিকপক্ষ ও সরকার শ্রমিকদের জিম্মি করে একটা বার্তা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে–মালিকদের শাস্তি দেয়া যাবে না, দিলে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা আটকে যাবে। কিন্তু আন্দোলনের কারণে মালিককে দিয়ে পুরো বকেয়া পরিশোধের সেই ধান্দা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। মালিক জামিন পেয়ে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগেই শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে বিজিএমইএ বাধ্য হয়েছে মালিক ছাড়াই দুই মাসের বেতন দেয়ার ঘোষণা দিতে। কিন্তু শ্রমিকরা পুরো তিন মাসের বকেয়া পরিশোধ না করলে অনশন ভঙ্গ করতে অস্বীকৃতি জানান। অপরদিকে বিজিএমইএ এক মাসের বেতন হলেও খুনি মালিক দেলোয়ারের জন্য আটকে রাখতে চায়। বিজিএমইএ চেয়েছিল, দুই মাসের বেতন নিয়েই শ্রমিকরা অনশন ভেঙে ফেলুক, যেন বাকি বেতন-ওভারটাইম বিজিএমইএকে দিতে না হয়। বিজিএমইএ যেন বলতে পারে, আন্দোলনে বাধ্য হয়ে তারা বেতন দেয়নি, বেতন দিয়েছে 'মানবিক কারণে'। তাছাড়া বিজিএমইএ সচেতন ছিল, গার্মেন্টস শ্রমিকদের এই সংগঠিত আন্দোলন যেন উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে না যায়। সে কারণে তারা আন্দোলনকারী শ্রমিকদের নেতৃত্বকে স্বীকার করতে চায়নি, চায়নি না তাদের পুরো দাবি মেনে নিতে।

অন্যদিকে সরকার প্রথম থেকেই পুরো ঘটনাটিকে দেখেও না দেখার ভান করেছে, দায় এড়ানোর সব ধরনের চেষ্টা করেছে। একটা পর্যায়ে সারা দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হলে সরকার শ্রমিকদের পুরো দাবি মেনে নিতে মালিকপক্ষ বা বিজিএমইএকে বাধ্য করার বদলে বিজিএমইএর সুরেই কথা বলেছে। শ্রমিকদেরকে আংশিক দাবি মেনে নিয়ে অনশন ভেঙে দিতে বলেছে। শ্রমিকরা স্বাভাবিকভাবেই তা মানতে না চাইলে অনশন ভাঙানোর জন্য সরকারের শ্রম প্রতিমন্ত্রী, নৌমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী বিজিএমইএ এবং কতিপয় দালাল সংগঠন, যারা তোবা শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারেকাছে ছিল না, তাদের নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে। তাতেও যখন কাজ হয়নি, তখন অনশনের দশম দিন ৬ আগস্টে সরকার মালিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার্থে তথাকথিত গণতান্ত্রিক মুখোশ খুলে সরাসরি ফ্যাসিস্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অনশনরত শ্রমিকদের অবরুদ্ধ করে তাদের বেঁচে থাকার সমস্ত রসদ সরবরাহ বন্ধ, এমনকি পানি-বিদ্যুতের সংযোগও কেটে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে অনশনের ১১ দিনের মাথায়, ৭ আগস্ট পৈশাচিক কায়দায় হোসেন মার্কেটের সপ্তম তলায় অনশনস্থলে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে, নির্মম লাঠিপেটা করে না খেয়ে থাকা শ্রমিকদের অনশনস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। অনশনের পর মালিক দেলোয়ার 'অবৈধ ধর্মঘটের' মিথ্যা অজুহাতে কারখানা বন্ধ ঘোষণা দেখিয়ে শ্রমিকদেরকে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা করেন, যদিও তোবা শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির আন্দোলনের কারণে তাঁর এই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। কারখানা বন্ধের জন্য শ্রমিকদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার করতে তিনি বাধ্য হন।

তোবা শ্রমিকদের এই সংগ্রামের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অর্জন রয়েছে–আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা মোটামুটি তিন মাসের বকেয়া বেতন ও ওভারটাইম আদায় করতে পেরেছেন, রাষ্ট্র, মালিকশ্রেণি ও বিভিন্ন দালাল সংগঠনের চেহারা শ্রমিকদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। এই আন্দোলনে বিভিন্ন বাম প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠন, ব্যক্তি, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সংস্কৃতিকর্মী, ছাত্র-তরুণদের সংহতি প্রকাশ, প্রতীকী অনশন, মিছিল-সমাবেশের মধ্য দিয়ে সারা দেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছিল। আগামী দিনে শ্রমিকশ্রেণির অধিকার আদায়ের আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সংহতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।❑

ফুলবাড়ী দিবস-২০১৪

'শহীদের খুনে রাঙা পথে দালাল বেঈমানের ঠাঁই নাই' স্লোগান সামনে রেখে গত ২৬ আগস্ট ২০১৪ সারাদেশে পালিত হয় ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থানের অষ্টম বার্ষিকী। শোক র‍্যালি, কালো ব্যাজ ধারণ, কালো পতাকা উত্তোলন, সমাবেশ ও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালিত হয় ফুলবাড়ীতে।

ফুলবাড়ী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সকাল ৭টায় কালো ব্যাজ ধারণের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচির সূচনা হয়। শহীদদের প্রতি শোক ও শ্রদ্ধায় এদিন ফুলবাড়ীর দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়, স্থানে স্থানে উড়তে থাকে কালো পতাকা। সকাল থেকেই স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করে। জাতীয় কমিটির কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় শোক র‍্যালি। র‍্যালি শেষে আমিন-তরিকুল-সালেকীনের স্মৃতির উদ্দেশে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর নিমতলী মোড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির সমাবেশ থেকে ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, এশিয়া এনার্জিকে উচ্ছেদ ও বড়পুকুরিয়ায় উন্মুক্ত কয়লা খননের সাম্প্রতিক অপতৎপরতা বন্ধের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৬ সালের এই দিনে পানিসম্পদ, আবাদি জমি ও মানুষবিনাশী ফুলবাড়ী উন্মুক্ত কয়লা খনন প্রকল্পের বিরুদ্ধে বাঙালি আদিবাসী নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধসহ লাখো মানুষের সমাবেশে সরকারি বাহিনী টিয়ার গ্যাস ছোড়ে, গুলি চালায়। শহীদ হন আমিন-তরিকুল-সালেকীন, গুলিবিদ্ধসহ আহত হন দুই শতাধিক। এরপর পুরো অঞ্চলের নারী-পুরুষরা গণ-অভ্যুত্থানের এক অসাধারণ পর্ব তৈরি করেন। সারাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। এরই এক পর্যায়ে ৩০ আগস্ট ২০০৬ চারদলীয় জোট সরকার জনগণের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। সারাদেশে উন্মুক্ত খনি নিষিদ্ধ ও এশিয়া এনার্জি বহিষ্কারের ধারাসহ এই 'ফুলবাড়ী চুক্তি'র প্রতি পূর্ণ সংহতি জানিয়ে ক্ষমতায় গেলে এই চুক্তি বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করেন ৪ সেপ্টেম্বর তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের দুই মেয়াদে ছয় বছর পার হলেও এখনো সেই চুক্তির মূল ধারাগুলোর বাস্তবায়ন হয়নি। কোনো বৈধ অনুমোদন না পেলেও ফুলবাড়ী কয়লা খনির ওপর লন্ডনে এখনো বেআইনিভাবে শেয়ার ব্যবসা করছে এশিয়া এনার্জি। শেয়ার ব্যবসার মুনাফার একাংশ ছড়িয়ে দেশে দালাল মন্ত্রী, এমপি, সাংবাদিক, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, কনসালট্যান্ট সৃষ্টি করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে চলছে উন্মুক্ত খননের সপক্ষে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার। বড়পুকুরিয়ার উত্তরাংশে উন্মুক্ত খননের সাম্প্রতিক অপতৎপরতা এরই অংশ।

নেতৃবৃন্দ সরকারের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, বড়পুকুরিয়া কিংবা ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত খননের চেষ্টা করা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। সমাবেশ থেকে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, বড়পুকুরিয়ায় উন্মুক্ত কয়লা খননের চক্রান্ত ও দালালদের তৎপরতা বন্ধ এবং এশিয়া এনার্জির অবশেষ উচ্ছেদের আল্টিমেটাম ঘোষণা করা হয়। নইলে আগামী ১ ডিসেম্বর ফুলবাড়ীতে ছয় থানার জনগণকে নিয়ে মহাসমাবেশের মাধ্যমে পরবর্তী কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এই সময়কালের মধ্যে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হলে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে সমাবেশ থেকে জানানো হয়।

দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকেল থেকে চলে প্রতিবাদী গানসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গণসংগীত পরিবেশন করে বিবর্তন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হয় কয়লা খনির ওপর স্থানীয় জনগণের মতামত নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'হাঁরা কয়লা খুনি চাই না', ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থানের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'ফুলবাড়ীর রক্ত পতাকা' এবং ভারতে উন্মুক্ত কয়লা খননের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'ফুলবাড়ী দেব না'।❑

কালাগুল চা বাগানে চা শ্রমিকদের টানা ধর্মঘট

সিলেটের কালাগুল চা বাগানের প্রায় দেড় হাজার স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক চা শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে গত ১ জুলাই থেকে মজুরি ৬০ থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত করাসহ ১০ দফা দাবিতে ধর্মঘট পালন করছেন। টানা ধর্মঘটে বন্ধ রয়েছে পাতা উত্তোলন ও কারখানার চা প্রক্রিয়াকরণের কাজ। ধর্মঘটরত শ্রমিকদের দিন কাটছে অভাব-অনটনে, খেয়ে না খেয়ে। কিন্তু মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়ার বদলে দমন-পীড়নের রাস্তা বেছে নিয়েছে। 'এক বাগানে মজুরি বাড়ালে অন্য বাগানেও বাড়াতে হবে'–এই বক্তব্য সামনে এনে গোটা মালিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষায় সরকার পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে, ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের আশ্রয় নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের নামে পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত করছে, বহিরাগত লোক এনে কালাগুল বাগানের শ্রমিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকরা আর্থিক টানাপড়েন ও দমন-পীড়নের মধ্যেও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যেতে অনড়। স্বাভাবিকভাবেই কালাগুল বাগানের চা শ্রমিকদের এই আন্দোলন সিলেটের অন্য চা বাগানগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে সিলেটের মালিনীছড়া, লাক্কাতুড়া ও খাদিম চা বাগানে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা।

বিভিন্ন নামি-দামি ব্র্যান্ডের যে চা খেয়ে আমরা প্রতিদিন তাজা হই, সেই চা উৎপাদন করতে গিয়ে শ্রমিকরা প্রতিদিন আরো নির্জীব হন। চা গাছ ছেঁটে ছেঁটে ২৬ ইঞ্চির বেশি বাড়তে দেয়া হয় না। চা শ্রমিকের জীবনটাও ছেঁটে দেয়া চা গাছের মতোই, লেবার লাইনের ২২২ বর্গফুটের একটা কুঁড়েঘরে বন্দি। মধ্যযুগের ভূমিদাসের মতোই চা বাগানের মালিকের সাথে বাধা তাঁর নিয়তি। দৈনিক মাত্র ৬০-৭০ টাকার মজুরি আর সপ্তাহে মাত্র তিন কেজি রেশনের চাল ও আটা দিয়ে পরিবার নিয়ে তিন বেলা খাবার জোটে না।

অন্যদিকে বাগান মালিকের জমি সরকারেরই খাসজমি, সামান্য অর্থে লিজ নিয়ে সস্তায় চা বাগান করে ফিনলে, ডানকান ইত্যাদি ব্রিটিশ স্টারলিং কোম্পানি, দেশীয় সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানি। ভর্তুকি মূল্যে সার পায় তারা, সহজ শর্তে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণও বরাদ্দ বাগান মালিকদের জন্য। ফলে মুনাফা তাদের কম নয়। চট্টগ্রামের নিলাম হাউজে প্রতি কেজি চা যখন ১৪৭ টাকায় বিকোয়, তাদের খরচ তখন কেজি প্রতি ৭০ থেকে ৮০ টাকা। ফলে মুনাফা বিপুল।

অথচ আন্দোলনরত চা শ্রমিকদের দাবি সামান্যই–দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা, পরিবার নিয়ে বসবাস করার জন্য ৭৫০ বর্গফুটের ঘর, বাগানে ভূমির অধিকার, সন্তানের শিক্ষা, পরিবারের সুষ্ঠু চিকিৎসা, চাকরি স্থায়ীকরণ ইত্যাদি। পার্শ্ববর্তী ভারতের চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দৈনিক ৯৫ রুপি বা ১২০ টাকা। এই মজুরি বাঁচার মতো যথেষ্ট নয় বলে ভারতের চা শ্রমিকরা দৈনিক মজুরি ২০০ রুপি বা ২৫০ টাকা করার আন্দোলন করছেন। আর বাংলাদেশে চা শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক মাত্র ৬৯ টাকা, যা ভারতের বর্তমান মজুরির অর্ধেক মাত্র! ফলে চা বাগানের ঘেরাটোপের মধ্যে চা শ্রমিকদের সামন্ত যুগের ভূমিদাসের মতোই মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

কালাগুল চা বাগানের শ্রমিকরা এই বাগান দাসের জীবন থেকে বেরিয়ে আসার আন্দোলন করছেন। তাঁরা অসাধারণ দৃঢ়তায় গত জুলাই মাস থেকে ধর্মঘট পালন করছেন। আমরা চা শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবির সাথে সংহতি জানাই। শুধু কালাগুল চা বাগান নয়, সমস্ত চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা করতে হবে।❑

গুম খুন ও বিচারহীনতা বাড়ছে

সরকারি কতিপয় কর্তাব্যক্তি ছাড়া সবাই স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের মানুষের জীবনের নিরাপত্তাহীতা বেড়েছে। র‍্যাব পুলিশসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী আইন আদালতকে অকার্যকর প্রমাণ করে একের পর এক ক্রসফায়ারের নামে মানুষ হত্যা করছে। নারায়ণগঞ্জে ৭ খুনের ঘটনায় সবার জানা তথ্যই প্রকাশিত হয়েছে যে, সরকারি বাহিনীর অনেক কর্তা এখন পেশাদার খুনিতে পরিণত হয়েছে। একইকারণে সাগর রুনী, ত্বকীসহ আরও অনেক হত্যাকান্ডের কোন বিচার নেই।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সর্বশেষ খবর অনুযায়ী এই বছরে এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক ব্যক্তি 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার' ও 'বন্দুকযুদ্ধ' নামে রাষ্ট্রীয় মিথ্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছেন। আইনী রক্ষাকবচ হিসেবে প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে একটি গল্প জুড়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অপরাধ দুটি: এক. বিনা বিচারে দেশের নাগরিকদের হত্যা। দুই. হত্যাকান্ড বিষয়ে অবিরাম মিথ্যাচার ও প্রতারণা। অন্যদিকে প্রকৃত খুনি ও সন্ত্রাসীদের ক্ষমতাসীনদের প্রশ্রয়ে দেয়া হচ্ছে আইনী আশ্রয়। আইন ও শালিস কেন্দ্র সংকলিত হিসাবে দেখা যায়, ২০১০ সাল থেকে এই পর্যন্ত প্রায় ৩ শ' মানুষ গুম হয়েছেন। এরমধ্যে ৫০ জনের লাশ পাওয়া গেছে, প্রায় ৩০ জনকে ছাড়া হয়েছে।

গত বছরের ৬ মার্চ নারায়ণগঞ্জে লাইব্রেরীতে পড়তে যাবার সময় স্কুল ছাত্র কবি শিল্পী তানভীর মুহাম্মদ ত্বকীকে অপহরণ করা হয়। পরে শীতলক্ষা নদীতে নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত তার লাশ পাওয়া যায়। এখানে এর আগেও নির্যাতন ও হত্যার শিকার মানুষের লাশ পাওয়া গেছে।

সুনির্দিষ্ট অভিযোগ, গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট এবং প্রমাণাদি থাকার পরও ত্বকীর অপহরণ ও হত্যার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বরং সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে তাদের ঔদ্ধত্ব আরও বেড়েছে। এই হত্যাকান্ডের একজন অন্যতম অভিযুক্ত আসামী শামীম ওসমান সরকারি দলের মনোনানয়ন পেয়ে এখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্য! প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে শামীম ওসমান পরিবারকে সবরকম পৃষ্ঠপোষকতার ঘোষণা দিয়েছেন।❑